ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহারে পৌঁছে পূর্বাপরতাসূত্রে আর একবার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করছি। আমরা লক্ষ করেছি ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তেমনি উত্তরবঙ্গের একটা বিশিষ্টতা বিদ্যমান। এই সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই অঞ্চলের লোকগীতি। লোকগীতির মধ্যেই এই অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, দৈনন্দিন কর্মধারা, আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্মানুষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক অনুশাসনের টুকরো টুকরো ছবি এক সাংস্কৃতিক সামগ্রিকতায় বিধৃত হয়ে এর ভিতর নিহিত রয়েছে। এই লোকগীতিগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য তাই অপরিসীম। মূলতঃ কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা ছাড়াও সমগ্র উত্তরবঙ্গের অন্যত্রও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। এদের নিজস্ব নানা আচার অভ্যাস, সংস্কার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে। এ হেন সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো অনেকাংশে সাধারণ শিষ্ট সমাজ থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতার প্রমাণ পাই এদের পারিবারিক পরিমন্ডলের মধ্যে। যেখানে নারীর একটি বিশেষ রূপ ও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং বস্তুত সেই কারণেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকগীতির মধ্যেও নারীজীবনের কথার প্রাধান্য এবং মর্মস্পর্শী চিত্রায়ন।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকগীতি সমাজের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষ উভয়কে ঘিরে, তবুও নারী যেন কেন্দ্রবিন্দুতে বিশেষ মহিমা ও গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত। এই দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেই বর্তমান গবেষণার অবতারণা করা হয়েছে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকগীতির মধ্যে বিধৃত এই নারীজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীজীবনের আলোচনার প্রয়োজনে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক বর্ণনা দেবার চেষ্টা

প্রাসঙ্গিকভাবে করতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলাতেই এদের বসবাস এবং এই সম্প্রদায় মূলতঃ কৃষিজীবি। সংসারে নারীর শ্রম, অবদান ও ভূমিকা গভীর ও লক্ষণীয় তথাপি সমাজে নারী যেন তার যথার্যোগ্য স্থান ও সম্মান থেকে বঞ্চিত। একদিকে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, সামাজিক সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন ও অনুষ্ঠানের আলোচনা সূত্রে যেমন এই সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে লোকগীতির মধ্যে এক পরিপূরক প্রতিফলনের মধ্যে এই অন্তর্জীবনকে আবিষ্কার করা হয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোকগীতি বলতে ভাওয়াইয়া ও চটকাকে বোঝান হয়েছে। এই গানগুলির পারিপার্শ্বিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এগুলি কোন পরিবেশে সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে। বিশেষতঃ তোর্ষা ও তিস্তা নদীর পার ঘেঁষে রাজবংশী গানের সুর ঘুরে ফেরে। কখনও বা সুদূর বাথান থেকে রাখালের রাখালীয়া গান শোনা যায়। আসামের গহন জঙ্গলেও মাহুত হাতী ধরতে যায় সুতরাং মাহুতের জীবনকে কেন্দ্র করেও গান সৃষ্টি হয়। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ব্রতকথা, পূজা আর্চাতে প্রচুর গান রয়েছে - সেগুলিও রাজবংশী লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু। এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নারীর প্রেম, তার প্রেমের অপার মহিমা যার কীর্ত্তনই ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের বিষয়বস্তু। এছাড়া আছে ওতপ্রোত-জড়িত এদের নিজস্ব সুর বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে কোন পরিবেশ থেকে গানগুলি উঠে এসেছে।। লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবাহ থেকে শুরু করে ফসল কামনার গান, ধর্মীয় আচার এবং ব্রতকথা আলোচনা করে দেখানো হয়েছে। সঙ্গীতগুলিতে যে নারীজীবনের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে তা দেখানো হয়েছে বিভিন্ন গানের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। ব্রতকথা পূজা আর্চাতে নারী যেভাবে একাত্ম হয়ে যায় তাতেও ধরা পড়েছে নারীর প্রকৃত রূপ। এক কথায় সংসার, প্রেম পূজা-আর্চা সব মিলিয়ে ফুটে ওঠে একটা বাস্তবমুখী চিত্র : "এই পরিপ্রেক্ষিতে

মনে হয় উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীতে বিধৃত নারীমন প্রকৃতপক্ষে এতটা কল্পনাপ্রবণ নয় যতটা বাস্তববাদী। বাস্তবতা তারা সহজে স্বীকার করে নেয়।" [১]

স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় অন্যান্য অঞ্চলের লোকগীতির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা। রাজবংশী নারীর সঙ্গে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের নারীর আন্তরিক মিল রয়েছে নানা দিক থেকে, বিশেষত: আচারে ও অনুষ্ঠানে। সবেতেই নারী অংশগ্রহণ করে, কখনও বা মুখে মুখে গানও রচনা করে। সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বজায় রাখতে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিবাহের গান, ফসল কামনায় গান, বৃষ্টি কামনায় গান, তাছাড়া আছে সারা বছর ধরে নানা পূজা আর্চা এবং ব্রতকথা, সর্বত্র নারীরই একচ্ছত্র ভূমিকা। সেদিক থেকে বলতে গেলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী রমণীর সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের রমণীর তফাৎ কিছু নেই। শুধু বলা যায় রাজবংশীদের ক্ষেত্রে জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার যেন আরো বেশি একাত্ম। কিন্তু যে ব্যাপারে রাজবংশী রমণী প্রকৃতই অনন্যা তা হল তার প্রেম। আর এখানেই রাজবংশী রমণীর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে নারীর প্রেমের মাধুর্য তাই প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রাজবংশী গান নরনারীর বিরহ মিলনের এক অপূর্ব গাঁথা, এখানে নারীর অন্তরের কথা ধ্বনিত ও স্পন্দিত হয়েছে গভীর মর্মস্পর্শী ভাবে। অভিমানী সে নারী, অভিমানের আলো আঁধারী আনে যেন এক অধরা অভিব্যক্তি। কখনো বা পুরুষ বিপর্যস্ত হয় সে অভিমানে। কুমারী মনের কামনা কখনো পূর্ণতা পায় প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনে। কখনো প্রেমিকা চঞ্চল হয়ে ওঠে, উন্মনা, পাগল পারা মন ছুটে বেড়ায় প্রেমাস্পদের অন্বেষণে। বলা বাহুল্য, পল্লীবালার প্রেমানুভূতির সুন্দর, সহজ, প্রাকৃত প্রকাশই ঘটেছে গানগুলিতে। শুধু তাই নয়, বিমল চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বলা যায়, 'রাজবংশী সমাজ জীবন যে ভাবে গড়ে উঠেছে ও যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তারই সঙ্গে সমান ছন্দে ও গতিতে এগিয়ে চলেছে রাজবংশী জনজীবনের গান ভাওয়াইয়া ও চটকা। সমাজের প্রতিটি মুহূর্তের ছবি বাঁধা পড়েছে এই দুই সঙ্গীতে।" [২]

কিন্তু নারী যে শুধু নির্ভেজাল সুন্দর শুদ্ধ প্রেমেই লিপ্ত তা নয়, পরকীয়া প্রেমেরও প্রচুর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। আর সেজন্যে প্রেমপাগলিনী নারী ঘর ছেড়েছে, ঝড় ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ করেছে প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য। আবার স্থিতু সমাজে, সংস্কারকে রক্ষা করে, স্বামী-সন্তানকে একান্ত ভালবেসে সংসারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার নিদর্শনও এই নারীই স্থাপন করেছে। এই চিত্রই গ্রথিত ও উপস্থাপিত হয়েছে লোকগীতিতে, তৈরী হয়েছে গোটা নারীসমাজেরই একটি সংহত আলেখ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লোকগীতিতে নারীর এই অপ্রতিরোধ্য বাঙময় প্রকাশ দেখে কেউ কেউ মনে করেছেন যে রাজবংশী সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ও নারীর ভূমিকা সে সমাজে অগ্রগণ্য।[৩] এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয় বলেই আমাদের ধারণা। প্রথমত, এই সমাজে সিদ্ধান্তের সর্বস্তরেই পুরুষের প্রাধান্য এবং প্রকৃত অর্থে এ সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। দ্বিতীয়ত, নারীর অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য থাকলে তা এই সমাজের লোকগীতির মূলসুর, যা কখনো করুণ, কখনো বঞ্চনার, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আসলে পশ্চাৎপদ একটি পরিমন্ডলে আবদ্ধ নারীর আর্তি, আকাঙক্ষা, আবেগ, অনুভূতি, অভাব, দারিদ্র ও নানাবিধ সমস্যাই এই লোকগীতির উপজীব্য, যা একদিকে দর্পন, অন্যদিকে সৃষ্টি। কল্পনা ও বোধের সংমিশ্রনে এই সৃষ্টি বাস্তবকে অতিক্রম করার আনন্দ যোগায় যে এ গান গায় তাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে শোনে ও এর সঙ্গে সংপৃক্ত হয় তাকেও। এই যে দ্বৈত অবস্থান, একদিকে নারীর উচ্ছল আবেগ, অন্যদিকে সংসার ও আচার নিষ্ঠা, একদিকে ভাওয়াইয়া-চটকা, অন্যদিকে পূজা ও ব্রতকথা এ দুইয়ের সমন্বয়ই এ জীবনকে ও সঙ্গীতকে করে লোকায়ত। এই রূপটি মহান হয়ে ওঠে নারীসুলভ সজীবতায় যেখানে দুঃখ ও বঞ্চনা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একটি চিরকালীন বৃত্ত রচনা করে। একদিকে প্রকৃতি ও প্রেম, অন্যদিকে সংসার, সমাজ ও সংস্কৃতি, এ দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটেছে এই সমাজের নারীর জীবনে যা একদিকে যেমন নারীর বিদ্রোহ ও আর্তিকে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে সমাজকেও স্থায়িত্ব দিতে পেরেছে। এই ভাবেই এ সমাজের বঞ্চিতা, পশ্চাৎপদ নারী নিজের মুক্তি নিজের মত করে

খুঁজেছে। শিক্ষার প্রসার না হওয়াতে এই সমাজের ইতিহাসে নারী আন্দোলনের মত কোন ঘটনা নেই, নেই কোন বিশেষ নারী প্রতিভা যে যোগাতে পারত সমাজকে নাড়া দেওয়ার মত নেতৃত্ব ও প্রেরণা। নারীর জন্য যেটুকু বলবার তা পুরুষকেই বলতে হয়েছে এবং তা সবসময়েই সময় ও সামর্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। বলা বাহুল্য বাংলায় সমাজ সংস্কারের যে সূচনা উনিশশতকে শুরু হয়েছিল তার কিছুটা অনুভব বা তার ঢেউয়ের কতকটা এই সুদূর উত্তরবঙ্গেও এসে পৌছেছিল। কিন্তু ফল ফলতে শুরু করেছিল অনেক পরে। এখানকার মানুষকে / নারীকে তাই উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য, মূলতঃ নির্ভর করতে হয়েছিল সরকারী উদ্যোগ ও অনুদানের উপর যা আবার অনেকাংশে রাজনীতি নির্ভর। স্বাধীনতার আগে এর সীমিত ও খণ্ডিত প্রয়াস দেখা যায় কুচবিহার ও জলপাইগুড়ির কোন কোন রাজার আমলে যার ফল সাধারণ্যে খুব কখনোই পৌছায়নি। স্বাধীনোত্তরকালে এর সুযোগ প্রসারিত হলেও সুদূর উত্তরবঙ্গে এর ছাপ পড়তে লেগে গেল কয়েক দশক। তাই আজও প্রত্যন্ত গ্রামে রাজবংশী সমাজ ও নারী দারিদ্র, বঞ্চনা ও অশিক্ষার অন্ধকারেই নিমজ্জিত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সমাজের ভেতর থেকে উঠে আসা চেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সে ইতিহাস ভিন্ন মনোযোগ দাবী করে, আমরা শুধু বলতে পারি সমস্ত জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরণের সময়োপযোগী আন্দোলন আজ তাত্ত্বিকভাবে প্রয়োজনীয় চালিকাশক্তি হিসাবে স্বীকৃত, যা না থাকলে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বাংলার নবজাগরণ, আজকের নারী আন্দোলন, বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলন বা সাবঅলটার্ন চেতনা ও আন্দোলন এরই প্রকাশ ও প্রমাণ। কিন্তু রাজবংশী সমাজে এ আন্দোলনও সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। এরও সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ আছে, সে আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। যা বলবার তা হল, রাজবংশী সমাজ দীর্ঘদিন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার শিকার, যার মধ্যে নারীর স্থান কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তবে বলা বাহুল্য এ সমাজ বন্ধ্যা নয় বরং প্রথম থেকেই এর মধ্যে লক্ষণীয় ছিল অগ্রসরতার একটা দুর্দমনীয় আর্তি। এই সম্প্রদায়ের লোকগীতিতে জীবনের এই দুটি দিকই ফুটে উঠেছে :

একদিকে পশ্চাৎপদতা অন্যদিকে অগ্রসরতার আর্তি। এই দ্বান্দ্বিকতা নারীর গানেও পরিস্ফুট। সে যেন তার বাস্তবকে তার সঙ্গীতের মাধ্যমেই অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর। লোকগীতির আবেগ ও উচ্ছ্বাসের অন্তরালে জীবনের এই প্রকৃত বাস্তবটিকে অনেকেই দেখতে ও বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সূত্র নির্দেশ

১। সুশীলকুমার ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভারতী বুক স্টল, ১৯৭০, পৃ.১২০

২। বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া ও চটকা, গ্রন্থমন্দির প্রকাশন, ১৯৯২, পৃ.১৪২

৩। তদেব